স্মৃতিতে ‘বীরাঙ্গনা’, ধর্ষণ ও যুদ্ধের অস্ত্র

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা

সময়টা ২০১১-এর বর্ষাকাল। খুলনার রূপসায় যাত্রা করেছি[১]। রূপসার বীরাঙ্গনা রঞ্জিতা মণ্ডল দীর্ঘ, শক্তপোক্ত গড়নের পঞ্চাশোর্ধ্ব হিন্দু নারী। রঞ্জিতা ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাশের গ্রামের দৌর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজাকারদের হাতে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। যুদ্ধপরবর্তীকালে তার প্রথম হিন্দু স্বামী রঞ্জিতাকে ছেড়ে চলে যান। একমাত্র কর্মক্ষম ভাই বোনের ধর্ষণ ও সংখ্যালঘু আত্মপরিচয়ের চাপের কারণে পরিবারসহ গ্রামে টিকতে না পেরে অবশেষে নিজের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে গিয়ে ডোমের কাজ শুরু করেন। জমি বেদখলের চাপের মধ্যে নিজের সন্তানসহ টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কবিরাজ রঞ্জিতাকে নিজের গ্রাম থেকে এক কন্যাসন্তানসমেত ‘বেশ্যা’ নাম দিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা পিতৃভিটে ছাড়া করেন। একমাত্র ভাই বোনের সামাজিক ‘বেশ্যা’ পরিচিতির কারণে তাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। নিজের মেয়েসহ রঞ্জিতা গ্রাম ছেড়ে তিন গ্রাম দূরে এক মুসলিম সৈনিকের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সে গ্রামের মানুষজন দাবি করে, রঞ্জিতা মণ্ডল তাঁর ধর্ম ও ঘর ছেড়ে এখন মুসলিম পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সংসার করছে। রাস্তাঘাটে ৭১-এর রাজাকার আর আজকের ‘জামায়াতের’ সেই নেতাদের চোখের সামনে পেলে রঞ্জিতা চিৎকার করে বিচার চান, গালিগালাজ করেন। তাঁকে গ্রামের মানুষ তাই ‘পাগলি’ বলে।

সিনেমা নির্মাণের অংশ হিসেবে পরিচালক ববি আর আমি রঞ্জিতা ও তাঁর স্বামী আবু তাহেরের সাথে কথা বলছিলাম। জীবনের নানান অসহায়ত্ব আর প্রতিকূলতার কথা শুনতে শুনতে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুলনার গাঢ় সবুজ চারপাশ তখন ভীষণ গাঢ় হয়ে উঠেছে। আমরা দুইজন ক্যামেরা নিয়ে রঞ্জিতা মাসির ছেড়ে আসা পিতৃভিটা দেখতে যাব। শহুরে গবেষক আমি যখন কাদায় ধীরে ধীরে পা দিয়ে দিয়ে সামনে এগোনোর চেষ্টা করছি, হঠাৎ মাসির বর্তমান স্বামী আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপা, এইসব কথা কইলে সে কি মুক্তিযোদ্ধা হইয়া যাইবো?’

হঠাৎ আমার চোখের সামনে ২০০৮ সালে দেখা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দেয়ালে টাঙানো সারি সারি ছবির ফ্রেম ভেসে উঠল। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ছবিগুলো আর তার ক্যাপশনের শব্দগুলো আমাকে সাহস জোগায়। দেয়ালের গায়ে সাঁটা ছবিগুলোর মধ্যে কতক বীরাঙ্গনা নারীদের ছবি। ছবিগুলো উদ্ধারকৃত বিবস্ত্র নিপীড়িত বীরাঙ্গনাদের কথা বলে আর সে ছবির নিচে বড়ো বড়ো অক্ষরে একটি ক্যাপশন লেখা দেখতে পেয়েছিলাম, ‘বীরাঙ্গনা বোন আমার!’ আচ্ছা, মুক্তিযোদ্ধারা কেন কেবল ভাই সম্পর্কে থাকেন না? মুক্তিযোদ্ধা পিতা, মুক্তিযোদ্ধা স্বামী, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হয়। এসব সম্পর্ক বীরাঙ্গনাদের বেলায় নেই কেন? আমাদের সমাজ বাস্তবতায় মুক্তিযোদ্ধা সনদ আর বীরাঙ্গনা সনদের মূল্য কি এক? বীরত্ব অর্জনের ইতিহাস কি একই সমতলে দাঁড়িয়ে আছে? আদৌ বীরাঙ্গনা সনদ বলতে কি কিছু আছে? বীরাঙ্গনা সন্তান কিংবা পরিবারের কোনো কোটা? রাষ্ট্রীয় সুবিধা কি আছে? বীরাঙ্গনা মায়ের সন্তান মাত্রই কি যুদ্ধশিশু? বীরাঙ্গনা মায়ের সন্তান কি আমাদের সমাজে সম্মানিত? আমার মাথায় প্রশ্ন আসে, বীরাঙ্গনা সনদ দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষীয়তার প্রমাণ দেওয়া কি আমাদের সমাজে সম্ভব?

[১] চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারজানা ববির ‘বিষকাঁটা’ সিনেমায় একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গবেষক হিসেবে কাজ করেছিলাম। রঞ্জিতা মণ্ডলের কথন সে সময় সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষিত ২ লক্ষ নারীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর হিসেবে 'বীরাঙ্গনা' (যুদ্ধের সাহসী নারী/যুদ্ধের হিরোইন) নামে ভূষিত করেন (ব্রাউনমিলার ১৯৭৫; মুখার্জী ২০০২)। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন নারী ধর্ষণের বিষয়টি খবরে আসতে থাকে এবং প্রকাশিত সংবাদগুলো আরও উল্লেখ করতে থাকে যে, 'প্রথাগত বাঙ্গালী গ্রামীণ সমাজে নারীদের পর্দার মধ্যে থাকতে হয় এবং ধর্ষণের শিকার নারী সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকেন'। মধ্য জানুয়ারিতে জেনেভায় ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চের এশিয়া শাখার ত্রাণ সচিব তাঁর প্রেস কনফারেন্সে বলেন, 'ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের সরকারের হিসেব অনুযায়ী ৯ মাসের এই যুদ্ধে ২ লক্ষের বেশি নারী পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। হাজার হাজার নারী গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন। সমাজের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো মুসলিম স্বামীই অন্য পুরুষ শরীর ছুঁয়েছে, এমনকি জোরপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়েছে এমন স্ত্রীকেও নিজ ঘরে ফিরিয়ে নেন না। নতুন সরকার এই প্রথা ভাঙ্গবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সরকার নারীদের জাতির বীর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদের ভিকটিম হিসেবে চিহ্নিত করছেন। সরকারের এই পদক্ষেপের পরেও অতি অল্প সংখ্যক স্বামী তাদের স্ত্রীদের বাড়িতে ফেরত নিচ্ছেন' (ব্রাউনমিলার ১৯৭৫)।

সমস্ত দেশজুড়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, মূলত যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ সহযোগিতা প্রদান, অ্যাবোরশন ক্লিনিক স্থাপন, বীরাঙ্গনা নারীদের বিয়ে দেওয়া, কারিগরি শিক্ষা প্রদান, ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নিয়ে নতুন সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন করে। নয় মাসব্যাপী ধর্ষণ, অপহরণ, জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি বাঙালি নারীর প্রতি সর্বোচ্চ মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষণের শিকার নারীদের বীরাঙ্গনা উপাধি প্রদানের মধ্য দিয়ে পুনরায় সমাজে ফিরিয়ে আনার, ধর্ষিতা নারীদের সমাজের সাথে সমন্বিত করার উদ্যোগ নিলেও সে উদ্যোগ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। বাঙালি সমাজে যেখানে নারীর পবিত্রতা ও পর্দা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ধর্ষণের শিকার নারীকে তাদের স্বামীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করবেন কিংবা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা অবিবাহিত ধর্ষিতা নারীকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবেন, এরকম আমূল মতাদর্শিক পরিবর্তন আদতে সম্ভবই ছিল না। ফলে বীরাঙ্গনাদের 'বিয়ে করবার' (marry them off) উদ্যোগ পুরোদস্তুর ব্যর্থ হয়। অল্প সংখ্যক পুরুষ সরকারকে 'পিতা হিসেবে' (শ্বশুর অর্থে) নিয়ে বীরাঙ্গনা নারীদের বিয়ে করতে এগিয়ে আসেন, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল মোটাসোটা মাপের যৌতুক সরকারের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া কিংবা গ্রহণ করা। এই যৌতুকের বহর এতই লম্বা ছিল যে সে সময়কার একজন সরকারি কর্মকর্তা বিরক্তির স্বরে জানান দেন, 'বীরাঙ্গনা নারীদের বিয়ে করতে প্রস্তুত পুরুষরা লাল রং করা জাপানিজ গাড়ি থেকে শুরু করে অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশ করে দিতে হবে এরকম' বিভিন্ন যৌতুক সরকারের কাছ থেকে দাবি করতেন (ব্রাউনমিলার ১৯৮৬)।

যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে সবচাইতে গুরুতর সমস্যা হিসেবে সামনে চলে আসে যুদ্ধের সময়কার ধর্ষণের কারণে নারীদের গর্ভবতী হয়ে পড়া। ঠিক কতজন নারী যুদ্ধকালীন ধর্ষণের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়েন, তার হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা না গেলেও সাধারণত ধরে নেওয়া হয় ২৫ হাজারেরও বেশি নারী

যুদ্ধকালীন ধর্ষণের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়েন[২]। 'যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহই কারোর ছিল না এবং জোরপূর্বক ধর্ষণের কারণে জন্ম নেওয়া শিশু পৃথিবীতে আসছে এইরকম ভাবনার ভয়ঙ্কর ভীতি নারীদের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে।'[৩] বাংলাদেশে সে সময়ে এটা স্বীকৃতও যে, পাঞ্জাবি গৌরবর্ণ চেহারা নিয়ে যে 'জারজ' (bastard) যুদ্ধশিশুর[৪] জন্ম হবে, সে কোনোদিন বাঙালি সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এমনকি সে শিশুর মায়েরও কোনো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই সামাজিক প্রেক্ষিতে ধনী পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের গর্ভপাতের জন্য কলকাতার দামি চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে, গ্রামীণ সমাজে গর্ভপাতের তেমন কোনো ভালো বিকল্প না থাকায় সন্তান গর্ভে থাকা নারীরা ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে থাকেন। বাদবাকিরা দেশীয় পদ্ধতিতে অনিরাপদ গর্ভপাতের ঝুঁকি নেন। অনেক ধর্ষিতা নারী গর্ভপাত করাতে গিয়ে নিদারুণ শারীরিকভাবে অসুস্থতার সম্মুখীন হোন (ডেভিস জিওফ্রে ১৯৭২; ব্রাউনমিলার ১৯৭৫)।

মাদার তেরেসার কলকাতার ক্যাথলিক আশ্রমের একটি শাখা যুদ্ধশিশুদের প্রবাসীদের কাছে দত্তক প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় কাজ করতে থাকে। প্রচারণা সত্ত্বেও খুব অল্প সংখ্যক ধর্ষণের ভিকটিম নারী মাদার তেরেসার আশ্রমে আসেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কেন্দ্রীয় শাখা ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে ১৭টি স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঠেকাতে গর্ভপাতের সেবা প্রদানের জন্য কাজ শুরু করে। কেবল ঢাকায় স্থাপিত ক্লিনিকেই প্রথম মাসে ১০০টিরও বেশি গর্ভপাত ঘটানো হয়। বাঙালি নারীদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন বোর্ড সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে ভীষণরকম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়— 'গর্ভপাত, নারীর ধর্ষণকে নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করা, কেবল বিয়ে নয় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করবার কথা'[৫] বলা হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই উদ্যোগের সাথে সাথে বাস্তবে দেখা যায়, এ সকল সুযোগ-সুবিধা নির্যাতিত বহু নারীর কাছে দেরিতে পৌঁছায় কিংবা কারো কারো কাছে কোনোদিনই পৌঁছায় নি। ফলে 'বীরাঙ্গনা নারীরা পতিতাপল্লীতে যেতে বাধ্য হোন' (ব্রাউনমিলার ১৯৮৬; মূখার্জী ২০০২; আখতার ২০০৪)।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ধর্ষণের বিষয়টি আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে স্বতন্ত্র নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান সৈনিকের হাতে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের নারী ধর্ষণের মাত্রা কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রামীণ নারীদের ধর্ষণের মাত্রার সাথে ৭১-এর বাঙালি নারীর ধর্ষণের মাত্রাগত কোনো অমিল নেই। মিল থাকলেও অপরাপর প্রেক্ষিত থেকে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ২ লক্ষ নারীর ধর্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধকালে সশস্ত্র পাক হানাদারবাহিনীর নিরস্ত্র নারীর ওপর ধর্ষণের বিষয়টিই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পরিসরে সমগ্র বিশ্বজুড়ে একটি রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে ৯ মাসব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এ দেশীয় রাজাকার দোসরদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বৃহত্তর পরিসরে একেবারে পদ্ধতিগতভাবে বাঙালি নারীদের ধর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভেঙে

---

[২] Rober, Trumbull, *Dacca Raising the Status of Women While Aiding Rape Victims*, New York Times, May 12, 1972.

[৩] International aid from Planned Parenthood: Jill Tweedie, *The rape of Bangladesh*, The Guardian London, March 6, 1972.

[4] 25,000 pregnencies: *Killing of Babies Feared in Bengal (AP)*, New York Times, March 5, 1972.

[5] Khushwant, Singh, *An Earning Woman–Bangladesh, after the first year: Will it ever be a workable country?*, New York Times Magazine, January 21, 1973.

দেওয়া এবং পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ধর্ষণের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি-বর্ণ তৈরি করা। এই নতুন জাতি-বর্ণ তৈরির সিদ্ধান্ত পুরোদস্তুর রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেই নিরস্ত্র নারীর ওপর সশস্ত্র পুরুষের নির্যাতন চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়ে ওঠে। উপরন্তু, মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি পুরুষদের হত্যা যেমন করা হয়েছিল, নির্যাতন করে অনেককে তেমন পঙ্গুও করা হয়েছিল। এমনকি, নির্যাতন সেলে বাঙালি পুরুষদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেওয়াও মূল লক্ষ্য ছিল।[৬] মুক্তিযুদ্ধকালীন ধর্ষণকে রাজনৈতিক নির্যাতন হিসেবে দেখা, মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখার সাথে সাথে ৭১-এর ২ লক্ষ নারীর ধর্ষণের বাস্তবতাতেই প্রথমবারের মতো গর্ভপাতের বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঠেকাতে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়।

১৯৭৫ সালের পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কথোপকথন থেকে বীরাঙ্গনা প্রত্যয়টিই নেই হয়ে যায়। তবে ৯০-এর দশক পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিরতিতেও বিভিন্ন সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও নাটকে বীরাঙ্গনাদের কথা উঠে আসতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে মধ্য আশির দশক থেকে নারী নির্যাতনের ওপর এক ঝাঁক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। গণমাধ্যমে ওই সময় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ওপর অধিক হারে সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী সময়ে নারী নির্যাতনকে ঘিরে নারী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের সাড়া আসতে থাকে। গণমাধ্যমের এই আকস্মিক উৎসাহের মূলে ছিল তৎকালীন স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমালা, যেটি রাজনৈতিক সমালোচনা ও ভিন্নমত প্রকাশকে নিবৃত্ত করতে কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করে। 'খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক না হয়ে সরকারকে সমালোচনার একটি পথ হিসেবে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার আলোচনায় গণমাধ্যমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়' (গুহঠাকুরতা ১৯৯৮)। পরবর্তী দশকে নিপীড়ন সম্পর্কিত নারীবাদী আলোচনা প্রবলভাবে সামনে আসতে শুরু করে। বৃহত্তর এই নারী অধিকার বিষয়ক একটি আপাতসচেতন পরিসরে বীরাঙ্গনাদের কথা আবার জনপরিসরে আসতে শুরু করে। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গণআদালত সে সময়কার বাংলাদেশের সরকারে থাকা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকারদের নেতা গোলাম আজমের শাস্তি দাবি করে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলন চালায় (মুখার্জী ২০০২)। গণআদালতে সন্তান তার পিতার হত্যা, সহোদর তার সহোদর হত্যা ও নির্যাতনের সাক্ষ্য দিয়েছে। সে সময়ই রাজাকার গোলাম আজমের শাস্তির দাবিতে গঠিত গণআদালতে ৩ জন বীরাঙ্গনা রাজাকার এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের বিভীষিকার সাক্ষ্য প্রদান করেন[৭]। ওই সময়ে বীরাঙ্গনা আবার পাবলিক ডিসকোর্সে, সাধারণ মানুষের কথোপকথনে ফিরে আসে।

৩.

পাবলিক স্মৃতিতে ফিরে আসা বীরাঙ্গনাদের কথা বলতে গিয়ে ১৯৭১-এ সিলেটের মনু নদীর তীরে ২০ বছর বয়সের তরুণী নীলিমার (ছদ্মনাম) স্মৃতিকথা উপস্থাপন করতে চাইছি। হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র সন্তান নীলিমার বাবা-মা দুজনেই পেশায় স্কুল শিক্ষক। যুদ্ধের শুরুতে মে মাসের মাঝামাঝি

[৬] একাডেমিক গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার কথ্য ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। এই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যারা অ্যার্মি ক্যাম্পে নির্যাতনের শিকার হন এবং বেঁচে ফিরে আসেন। বেঁচে যাওয়া ৩ জনের মধ্যে ২ জনের সারা জীবনের জন্য সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং যৌনাঙ্গসমেত শরীরের নাজুক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার সম্মুখীন হন। নির্যাতন সেলে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ূপথে সিদ্ধ ও গরম ডিম প্রবেশ করানো, অণ্ডকোষে গরম পানি ঢালা, যৌনাঙ্গে প্রহার, পা ও নিতম্ব পেরেকের ওপর রাখা, ইত্যাদি নির্যাতনের কথা কথ্য ইতিহাসে উঠে আসে। একজন নির্যাতিত যোদ্ধা নির্যাতনের কারণেই পরবর্তী সময়ে জখম থেকে পায়ূপথের ক্যানসারে আক্রান্ত হোন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল নারীর সাথে যৌন সহিংসতা ঘটেছে তা নয়, পুরুষ মুক্তিযোদ্ধারাও বিভিন্ন ধরনের যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রসঙ্গটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার দাবি রাখে।

[৭] Bhorer Kagoj 27/3/92; Doinik Jonokonth, 28/3/92

সময়ে নীলিমার বাবা-মাকে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী সগৃহে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাবা-মায়ের লাশ পড়ে থাকে বাড়ির ভেতরে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা মনু পাড়ের বাড়ি থেকে সিলেটের শামসুন নগর টর্চার ক্যাম্পে বিধ্বস্ত নীলিমার জায়গা হয়। মে থেকে ডিসেম্বর— এই সাড়ে সাত মাস ক্যাম্পের অমানুষিক যৌন অত্যাচার শেষে ৭ মাসের গর্ভবতী নীলিমা ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে আর্মি ক্যাম্প থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায়ই বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন। বিজয়ের ছয় মাস পর ৪ মাসের যুদ্ধশিশুসহ নীলিমা মামার সংসার থেকে পুনরায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হোন। কখনো ভিক্ষা করে, কখনো ঘরের কাজ করে, এমনকি বেশ্যাবৃত্তি করে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা নীলিমার সাথে হঠাৎই কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়ে যায় মৃত পিতার পূর্বতন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা জালালের (ছদ্মনাম) সাথে। কলকাতায় নিজের নিখোঁজ পরিবারকে খুঁজতে আসা জালালকে বিয়ে করে নীলিমা কলকাতাতেই থাকতে শুরু করেন। বিয়ের সাত বছর বাদে ৮০-র দশকে নীলিমা-জালাল দম্পতি ঢাকায় আবার নতুন করে নতুন পরিচয়ে জীবন শুরু করেন। কেবল ৭২ থেকে যুদ্ধশিশুর জন্ম সে সময় ১৯৭৫-এও নেমে আসে। পরিবার পরিজনহীন নীলিমাকে এখন সবাই মুক্তিযোদ্ধা জালাল সাহেবের স্ত্রী হিসেবেই চিনে থাকেন। আর যুদ্ধশিশুকে চেনেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলে; বীরাঙ্গনার সন্তান নয়, যুদ্ধশিশু তো নয়ই। বীরাঙ্গনা নীলিমা প্রতিদিন তার বীরাঙ্গনা হবার ইতিহাস ভুলে থাকতে চান, ভুলে যেতে চান তার যুদ্ধশিশুর কথা, ভুলে থাকতে চান তার সন্তানের জন্ম ইতিহাসের কথা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় নিস্তব্ধ গবেষক আমি ঘটনা শোনার আকস্মিকতায় কেবল বলতে পেরেছিলাম, 'আপনি কেন প্রকাশ করতে চান না? এখন সময় বদলেছে মনে হয় না আপনার?' নীলিমা বলেছিলেন, 'আমি কি মুক্তিযোদ্ধা নাকি রে মা!' (শুভ্রা, ২০১২)।

নারীর প্রতি যত ধরনের সহিংসতা দেখা যায়, তার মধ্যে ধর্ষণই হচ্ছে সবচাইতে প্রচলিত ও সামাজিকভাবে অপমানজনক। প্রথাগত মতাদর্শে মনে করা হয়, ধর্ষণ আঘাত হানে 'সম্মান' বা 'ইজ্জতের' ওপর। এই পুরুষালি মতাদর্শেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বীরাঙ্গনা নারীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়, '২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত হরণ'। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই ইজ্জত কার ইজ্জত? গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই ইজ্জত বা সম্মান নারীটির পরিবার ও সমাজের ইজ্জত, যে ইজ্জতের মালিক সমাজের অভিভাবক, নারীর অভিভাবক। সোজাকথায়, পুরুষালি ভাবনার এই সমাজে নারীর অভিভাবক পুরুষ। এই পুরুষ হতে পারে নারীর পিতা, ভাই, স্বামী কিংবা পুত্রসন্তান, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মানে, কোনো নারীকে ধর্ষণ করা মানে তার সমাজের সীমাকে লঙ্ঘন করা, তার সামাজিক পবিত্রতায় আঘাত হানা। নারীর অভিভাবক, তার সমাজ-অভিভাবক পুরুষের পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করা। এই বাস্তবতায় নারীর প্রতি সহিংসতা কিংবা ধর্ষণ যতটা না নারীর প্রতি সহিংসতা, যতটা না নারীর শরীরের প্রতি সহিংসতা, তার চাইতে বেশি ধর্ষণকে নৈতিকতা, পবিত্রতা, সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্বের অবকাঠামোর মধ্যে দেখা হয় (শুভ্রা ২০১৩; ২০১৫)।

ধর্ষণের ইজ্জত হরণের অংশ হয়ে ওঠাই খোদ পুরুষালি মতাদর্শের বিষয়। আর তাতেই ধর্ষণ অপরাপর নির্যাতন থেকে ভিন্নভাবে একটা পরতের পর পরতের নিপীড়ন তৈরি করবার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ একটি পুরুষালি রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠে। পুরুষালি ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, যে ক্ষমতাচর্চার কেন্দ্র হচ্ছে নারীর শরীর। আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতায় কোনো পুরুষকে শায়েস্তা করতে গেলে তাকে প্রহার করা হয়। অন্যদিকে, কোনো নারীকে বা তার অভিভাবক পুরুষকে শায়েস্তা করতে হলে সে নারীর ওড়না ধরে টান দিলেই চলে, তাকে ধর্ষণ করলেই চলে। আবার

অপরদিকে, কোনে পুরুষের অভিভাবকত্ব, তার পৌরুষের 'সম্মান' তার সামাজিকভাবে অধীনস্ত 'নারীর' শরীরী শুচিতা রক্ষার মধ্যে প্রোথিত থাকে। নিপীড়নের একটি লিঙ্গীয় ধরন বিদ্যমান, যেখানে পুরুষালি মতাদর্শের পৌরুষকে বলবৎ ও সক্রিয় রাখবার এবং পুরুষালি মতাদর্শের পবিত্রতা রক্ষার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকে নারী, নারীর শরীর। অর্থাৎ, পাকিস্তানি পাক হানাদারবাহিনী যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাঙালি নারীকে 'বীভৎসতম' ধর্ষণ করে গেছে, তার ভিত্তি তৈরি ছিল বাঙালি পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিতরেই; যে মতাদর্শ বীরাঙ্গনা নারীকে যুদ্ধের সময়কার ধর্ষণের কারণে 'অপবিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করে গেছে, যে মতাদর্শ ক্রমাগত সামাজিক এই ভাবনা দাখিল করে গেছে যে যার ধর্ষণ হয়েছে তার ইজ্জত নেই, সম্ভ্রম নেই। ইজ্জত ও সম্ভ্রম নেই যে নারীর তার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়, ধর্ষণের শিকারের আত্মহত্যা করাটাই শ্রেয়— এই চর্চা আমরা যুদ্ধপরবর্তী আজকের বাংলাদেশেও অসংখ্য নারীর জীবনে দেখতে পাই। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যার প্রথম উদ্যোগ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েরই। ধর্ষণের ট্রমার ভিত আমরা বীরাঙ্গনা নারীদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করবার মধ্যে দিয়েই আমাদের সংস্কৃতিতে, সমাজে প্রোথিত করে দিয়েছি।

৪.

যুদ্ধাপরাধের দলিলসমূহে ধর্ষণ ও নির্যাতনকে পৃথকভাবে দেখা হয়েছে এবং প্রথম দিককার দলিলসমূহে ধর্ষণকে নির্যাতনের চাইতে তুলনামুলক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭)। ধর্ষণকে নির্যাতনের একটি ফর্ম হিসেবে দেখার নারীবাদী আন্দোলন ও দাবির একটি ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা রয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

প্রচলিত মতানুযায়ী মনে করা হতো, যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্যাতন করা হয়। আধুনিক বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বন্দিকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সমাজের ভেতরকার প্রতিরোধ ভেঙে ফেলবার জন্য নির্যাতন করা হয়। নারীর কাছ থেকে কেবল তথ্য সংগ্রহ নয় বরং সশস্ত্র সংগ্রামে পুরুষরা যখন সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেন, সে সময় নারী ও শিশু ঘরে থাকে, সংসারের হাল ধরে রাখে নারী, দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় থেকে সমাজকে টিকিয়ে রাখে নারী। নারী তখন হয়ে ওঠে সিভিল সমাজের কর্ণধার (ব্রাউনমিলার ১৯৮৬; গুহঠাকুরতা ১৯৯৭)। সিভিল সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ওঠা নারীদের তখন ধর্ষণ ও ধর্ষণের ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে গৃহছাড়া হতে বাধ্য করা হয়। নারীর গর্ভে শত্রুর সন্তান প্রদানের মধ্য দিয়ে, নারীকে ধর্ষণের মাধ্যমে অপবিত্র করে সমাজচ্যুত করবার মধ্য দিয়ে হানাদারবাহিনী আদতে সমাজ কাঠামো ভেঙে ফেলবার রাজনৈতিক লক্ষ্যেই পুরুষালি ধর্ষণক্ষমতা ব্যবহার করে (শুভ্রা ২০০৮)। এই প্রেক্ষিতে নারীবাদীরা ধর্ষণকে নির্যাতনের একটি রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাঁরা বলেন, কেবল ধর্ষণই একটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য (রোন্ডা কোপলান ১৯৯৪)।

কিন্তু অধিকাংশ যুদ্ধাপরাধের আইনে দেখা যায় যে, ধর্ষণ যখন গণহত্যার হাতিয়ার বলে চিহ্নিত হয় তখনই তা যুদ্ধের সময়কার নির্যাতন হিসেবে গুরুত্ব পায়। এ ক্ষেত্রে কেবল ধর্ষণই গুরুত্ব পায় না, আদালতে বিচার চাইতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে এই ধর্ষণের ঘটনাটি আরও বৃহৎ আকারের নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত, যে নির্যাতনের ভিত্তি হতে পারে জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী কিংবা কোনো বিশেষ ধরনের রাজনীতি। নারীবাদীরা এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলেন যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক নির্যাতনের স্বীকৃতি

থাকলে কেন জেন্ডার কিংবা নারীত্বের জন্য সংঘটিত নির্যাতনের ধরনকে নির্যাতন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না?

এই প্রেক্ষিতে ডোরিয়ান মার্গারেটা কোয়েনিগের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রূপরেখা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। কোয়েনিগের মতে, ধর্ষণকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের' বিধি বাদে অন্যান্য বিধিতেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায়। জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধের সনদে মূলত চার ধরনের যুদ্ধাপরাধের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো :

১. গণহত্যা;
২. গুরুতর সীমা লঙ্ঘন;
৩. যুদ্ধের আইন ও সংস্কারের লঙ্ঘন;
৪. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

গণহত্যার বিধিতে বলা হয়, ইচ্ছাকৃত হত্যা, দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করা, পরিকল্পিতভাবে কোনো গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য শর্ত আরোপ, গোষ্ঠীর ভেতরে জন্মনিয়ন্ত্রণের নীতি আরোপ করা এবং এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে শিশু পাচার করা— এই প্রক্রিয়ার নির্যাতন যদি কোনো জাত, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপর আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে ঘটে, তাহলে সেটা গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত হবে। কোয়েনিগের মতে, গণহত্যার বিধিতে ধর্ষণের উল্লেখ না থাকলেও ধর্ষণের মাধ্যমে এরকম নির্যাতন ঘটে থাকলে অবশ্যই ধর্ষণ গণহত্যা অপরাধের আওতায় পড়বে। ইচ্ছাকৃত হত্যা, নির্যাতন, অমানুষিক আচরণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ভয়ানক পীড়া দেওয়া, দৈহিক বা স্বাস্থ্যগতভাবে গুরুতররূপে আহত করা, কিংবা কোনো নাগরিককে বেআইনিভাবে আটক করা— এই অপরাধগুলোকে গুরুতর সীমা লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধকালে নিরস্ত্র নারী ও শিশুকে নিরাপত্তা দান করে। নাগরিকদের ওপর এককভাবে গুরুতর সীমা লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হলেও সেটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গৃহীত হবে। এই বিধিতে চরম আকার ধারণকারী ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যুদ্ধের আইন ও সংস্কারের লঙ্ঘনে ধর্ষণ অমানুষিক, বর্বর ও হিংস্র আকার ধারণ করলে সেটি শাস্তিযোগ্য বিষয়। জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে হামলা করবার একটি মাধ্যম হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয় এবং এই অপরাধ অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাবস্থাতেও প্রযোজ্য হতে পারে এবং যে কোনো দেশে এর বিচার হতে পারে (কোয়েনিগ, ১৯৯৪)।

এই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কোরিয়ান ও ফিলিপিনো 'কমফোর্ট নারীদের' জাপানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমা প্রদর্শনের দাবি এবং বসনিয়া ও রোয়ান্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মীরা ধর্ষণকে পৃথকভাবে একটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করবার জোর দাবি তোলেন (গুহঠাকুরতা ১৯৯৭)। ১৯৯৫ সালের বেইজিং ঘোষণায় ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এই আইনের আওতায় পূর্বের কেবল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া ধর্ষণ তখনই যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচ্য হবে, যখন ধর্ষণ একটি জনগোষ্ঠীর ওপর বিস্তৃত বলে প্রমাণিত এবং যে ধর্ষণ কোনো ধর্মীয়, জাতিগত কিংবা রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়েছে।

৫.

নারী জীবনে ধর্ষণের অভিজ্ঞতা কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ঘটনার কথা বলে না। খুন, অপহরণ, ছিনতাই, গুম কিংবা ফৌজদারি অপরাধের অপরাপর যে কোনো ধরন থেকে ধর্ষণ ভিন্ন হয়ে ওঠে তার সামাজিক অর্থের জন্য। সামাজিক অর্থে ধর্ষণ ঘটা মানে নারীর জীবনের 'সর্বনাশ' ঘটে যাওয়া, তার 'সম্ভ্রম' চলে যাওয়া। নারীর অস্তিত্ব কেবল একটি ধর্ষণের বাস্তবতার মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, তার শরীরী শুচিতা ও পবিত্রতার ধারণা ভেঙে যাওয়া। একটি সমাজ-অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহৃত 'নারী শরীর" মানেই ধর্ষণ। আর পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, আইন, সমাজ, মতাদর্শ, নানাবিধ সম্পর্ক, এমনকি রাষ্ট্র ধর্ষণের পরে ধর্ষিত নারীটির প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। ধর্ষণ বলতে আমরা যতটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, 'সম্ভ্রমহানি', 'ইজ্জতহানি', যৌন হয়রানি', 'ইভ টিজিং'— এরকম শব্দগুলো আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে বলে যেতে তার চাইতে অধিক আরাম বোধ করি। আসলে আমাদের বলবার মধ্যেই প্রোথিত আছে সে সকল সামাজিক 'পুরুষালি' ভাবনা যে, কেন আমরা ধর্ষণের পরেও ধর্ষিতা হতে চাই না? কেন আমরা যে কোনো বিত্তের নারী হিসেবে কোনো না কোনোভাবে আমাদের ধর্ষণের অভিজ্ঞতা দমন করে নিশ্চুপ হতে থাকি? কেনই-বা একজন বীরাঙ্গনা নারীকে, তার বীরত্বকে 'বীরত্ব' করে তুলবার জন্য, বীরাঙ্গনার সম্মান অর্জনের জন্য মুক্তিযোদ্ধার নাম ধারণ করবার ইচ্ছা পোষণ করতে হয়? কেন বীরাঙ্গনা নিজে বীরত্ব-সম্মানের নিজস্ব একটি ধরন তৈরি করতে পারেন না? কেন বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাষ্ট্রীয় নানাবিধ সুযোগ অর্জনে বীরাঙ্গনা কোটা থাকে না? বীরাঙ্গনা মায়ের কোটা কেন সম্মানিত কোটা হয় না?

ধর্ষণের সামাজিক অর্থ আমাদের সমাজের দেহগত পবিত্রতার ধারণার সাথে জড়িত। আমাদের সমাজে একজন নারীর ইজ্জত 'কচুপাতায় রাখা এক ফোঁটা জলের মতো' টলটলায়মান থাকে। কখন কীসে কীভাবে সেটা অতি দ্রুত ছলকে পড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা আমাদের বাস্তবতা নারী হিসেবে আমাদের দেয় না। আমরা নারীরা শিস খেতে খেতে নারী হয়ে উঠি। চলতে ফিরতে আমাদের নানাবিধ শরীরী মূল্যায়নের মন্তব্য শুনে যেতে হয়। ধর্ষণের সম্ভাবনা আমরা কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে, রাস্তাঘাটে, যুদ্ধে, শান্তিতে নানা জায়গায় নানাভাবে আপন ও পর সম্পর্কে ধারণ করে চলি। সমাজের চোখে এই সকল ঘটে যাওয়া নিপীড়নের দায়ভার আবার নারীদের ওপরই বর্তায়। আমরা নারীরা কেবল 'ভোগের বস্তু' বলে নিজেদের যে কোনো আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে, নিজেদের অস্তিত্বের যে কোনো বিন্যাসে, যে কোনো সময় যে কোনো পরিসরে, যে কোনো 'পুরুষালি এজেন্টকে' কোনো না কোনোভাবে প্রলুব্ধ করবার সামাজিক দায়ভার নিয়ে জীবনযাপন করে চলি। ২০০০ সালের টিএসসির মিলেনিয়াম বাঁধন কিংবা ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নারী চিকিৎসকের ধর্ষণের কারণে মৃত্যু কোনোটাই এই পুরুষালি শরীরসর্বস্ব নারীত্বের ভাবনার বাইরের নয়।

বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত এই মতাদর্শিক শেকড় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও সমান বিদ্যমান। '২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে এই স্বাধীনতা'— এই ভীষণ জাতীয়তাবাদী 'পুরুষালি' বাক্য নারীর নিপীড়নকে যতটা না প্রকাশ করে, তার চাইতে নারীকে সম্ভ্রমহীনই করে তোলে বেশি। এমন কোনো সুযোগ এই মহাবয়ান তৈরি করে না যে, বীরত্ব কেবল যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো নয়, ধর্ষণের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মধ্যেও নারী সমান দুর্জয় বীরত্ব দেখাতে পারে— এই ধারণা কখনোই যুদ্ধের প্রথাগত ভাবনা তৈরি করে না। 'ইতিহাসজুড়ে, সারা পৃথিবীতে, আমাদের সামষ্টিক চেতনায়

যোদ্ধার ভূমিকা পুরুষের জন্যই তুলে রাখা। যুদ্ধ ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে নারীকে নেতা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় দেখার রেওয়াজ নেই' (গায়েন, ২০১৩)। 'দাম দিয়ে কেনা বাংলা', 'আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে কেনা বা অর্জন করা স্বাধীনতা, 'সম্ভ্রম দিয়ে' পাওয়া জাতি এবং দেশ— এই ভাষা-অলংকারগুলো খোদ মহান সংগ্রামের লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সংগঠনের আকৃতিতে পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে (খাতুন, ২০১৫)। যে কারণে নির্যাতনের পরেও আমরা 'ধর্ষণের ভিকটিম নারীর' পরিচয় ধারণ করতে রাজি থাকি না, যে কারণে ভিকির শিক্ষার্থী নারীটি ধর্ষণের অভিজ্ঞতা প্রকাশের পর সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে। ঠিক একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'বীরাঙ্গনাদের' সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে সমাজ আমাদের কেবল তাদের সাথে 'বোনের' সম্পর্ক পাতানোর শিক্ষা দেয়। আমাদের সমাজে শরীরী পবিত্রতার মধ্য দিয়ে নারীর জন্য বিয়ের যে সামাজিক 'স্বাভাবিকত্বের' ছবি তৈরি হয়, সেই ছবি ধর্ষণকে গ্রহণ করে না। কাঙ্ক্ষিত 'স্ত্রী', কাঙ্ক্ষিত আদর্শ 'মা', এমনকি কাঙ্ক্ষিত কন্যা, কাঙ্ক্ষিত বোন সামাজিক শরীরী পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া সম্পর্ক আর তাতে ধর্ষিতার কোনো স্থান নেই। ফলে অতি সহজেই যেখানে পুরুষালি ভাবনায় আপনি ধর্ষণের পর ধর্ষককে প্রলুব্ধ করবার সামাজিক দোষারোপে (যেমন, প্রেমের সম্পর্ক ছিল, পরিচিত ছিল, একলা ছিল, শরীরে ওড়না ঠিক ছিল না, পোশাক ঠিক ছিল না, রাস্তায় রাতে বের হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি) নানান সামাজিক ভাবনার হাত ধরে যে কোনো পরিস্থিতিতে 'বেশ্যা' হয়ে উঠতে পারেন; সেখানে নারী হিসেবে আপনাকে সম্মান করে 'বোন' ডাকাটার মধ্যেই সমাজ বাস্তবতা যুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার মরীচিকা দেখাতে পারে। বীরাঙ্গনা নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা দেখানোর মধ্যে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। সমস্যা এই পন্থাটাকে একমাত্র ভাববার মধ্যে বিরাজ করে। কারণ এই সম্মান প্রদানের সম্মান, অর্জনের নয়। অর্জন নয় বলেই সেটি বীরাঙ্গনাদের সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হয়ে ওঠে, আর তার মধ্য দিয়ে বীরাঙ্গনা নারী হিসেবে নারীর পরিচিতি ও সক্রিয়তার বহুবিধ দিক ক্রমাগত অস্বীকৃত হতে থাকে। সমাজ তাই আমাদের সামনে একটা মরীচিকাই আজ অবধি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। হয় আপনি ধর্ষণের, নিপীড়নের অভিজ্ঞতা নারী হিসেবে কোথাও না বলে মুখ বন্ধ করে রাখবেন, নিশ্চুপ থাকবেন, নিশ্চুপ থেকে স্বাভাবিক সমাজ জীবন যাপন করবেন; না হয় আপনার 'ধর্ষণের' স্মৃতি এমনকি পরিচয়কে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান করবেন। তা না হলে আপনি হয়ে উঠতে পারেন কেবল 'বেশ্যা'। আইনের কাছে সমাজের কাছে বিচার চাইলে আপনাকে কেবলই 'ধর্ষিতার' পরিচিতিসমেত আশ্রয়কেন্দ্রের সময়হীন জীবনে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলতে হবে কিংবা আপনি হবেন সমাজচ্যুত। সে আবদ্ধ জীবনকেও সমাজ অনেক সময় 'খারাপ নারীর' চোখেই দেখবার শিক্ষা দিয়ে যায়।

নারী সামাজিকভাবে মহান তার মাতৃত্বে। মাতৃত্বের পবিত্রতাও আমাদের এই পুরুষালি সমাজে তার মেয়েদের ধর্ষণের কারণে সামাজিকভাবে 'অপবিত্র' হয়ে যাওয়াকে স্বীকার করে না। স্বীকৃতি দেয় না যুদ্ধোত্তর সমাজ, দেশ এবং বাস্তবতা। কেননা পুরুষতন্ত্রের নির্মিত মায়ের অবয়ব যতটা পবিত্র, ধর্ষিত নারীদেহ ততখানিই অপবিত্র। এই সূত্রে ১৯৭৫-এর মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, নয় মাসের যুদ্ধে ধর্ষণ, অপহরণ, জোরপূর্বক ক্যাম্পে রেখে বেশ্যাবৃত্তি করানো ইত্যাদি যা কিছু যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত, সেসব বাঙালি নারীর (আদিবাসী ও বিহারী নারীদের জন্যও) লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রথম রাউন্ড মাত্র (ব্রাউনমিলার; খাতুন, ২০১৫)। যৌন সহিংসতার শিকার নারীরা নিজের পরিবারে-সমাজে চক্রকারে পৌনঃপুনিক দৈহিক-মানসিক-যৌন সহিংস আচরণের শিকার হতে থাকে। ইতিহাসে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় তাই একান্তই মায়ের জন্য ছেলের ছিনিয়ে আনা বিজয়। পুরুষ হলেন বীর আর নারী হলেন যুদ্ধের

ক্ষয়ক্ষতি। তার বীরাঙ্গনা উপাধি কোনোদিনই 'ক্ষতিগ্রস্ত', 'নেতিবাচক', 'অপবিত্রতা'র ধারণার বাইরে যেতে পারে না। বিজয়ী সে 'অপবিত্র' নারী কোনোদিনই হতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনারা তাই মরে গিয়ে, মানসিক ও শারীরিক ট্রমায় থেকে, সমাজবিচ্যুত হয়ে, নিজেদের পরিচয় গোপন করে অদৃশ্য হয়ে যান। যুদ্ধাপরাধের ধারণা ও আইনি বিবেচনা দিয়ে সামাজিক মতাদর্শগত এই দুর্ভোগকে বোঝা দুষ্কর। স্বয়ং মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় কম হলেও কেন বাঙালি নারীকে ধর্ষণ করেছিল, তার সামাজিক ব্যাখ্যা ধর্ষণের যৌন সংস্কৃতির বোঝাপড়ার মাধ্যমেই কেবল আন্দাজ করা সম্ভব (খাতুন, ২০১৫)।

সমাজের প্রভাবশালী এই ধর্ষণকেন্দ্রিক বিস্মৃতির অসম ভাবনার ভিত হিসেবে বিদ্যমান ধর্ষণের সাথে বিরাজমান লজ্জা-অপমান-ভীতি-হেরে যাওয়া-সম্ভ্রমহীনতা-মিথ্যাবাদিতার মুখ। যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, সে ব্যবহৃত হয়েছে, সে শিকার হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের ক্ষেত্রেও তার উপরকার অপরাপর নিপীড়নের চাইতেও ধর্ষণের গল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'সামাজিক ট্রমা শো' পরিতৃপ্ত করবার তাগিদ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নারী নিপীড়নের অভিজ্ঞতার 'হার-স্টোরির হাওয়া হয়ে যাওয়া, নারী অ্যাক্টরের পতন আর ভিক্টিম দশায় বিস্মরণে চলে যাওয়াতেই' (খাতুন, ২০১৫)। 'বীরাঙ্গনা' কোটায় কোনো নাগরিক সুবিধা অর্জিত হয় না— এই সামগ্রিক ঐতিহাসিক ধর্ষণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে ধর্ষণকে হতে হবে প্রত্যেক ধর্ষিতার স্মৃতির সবাক বর্তমান। কারণ সমাজে নারীরাই হচ্ছে সেই সামাজিক অস্তিত্ব, যাদের নির্যাতন, নির্যাতনের স্বীকারোক্তি, নির্যাতনের অভিজ্ঞতা স্বয়ং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি দুর্বার প্রতিবাদ। আশা রাখি, এই প্রক্রিয়াতেই নারীবিদ্বেষী ইতিহাসের বিপরীতে বীরাঙ্গনার স্মৃতি হয়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বলতর সবাক ইতিহাস।

বীরাঙ্গনা রঞ্জিতা মণ্ডলকে দিয়েই আজকের লেখাটা শেষ করতে চাইছি। আমি আর ববি যখন টানা কিছুদিন রঞ্জিতা মাসির বাড়িতে সিনেমার কাজে যাওয়া-আসা করছি, 'বীরাঙ্গনা হিসেবে রঞ্জিতার খোঁজে কেউ ঢাকা থেকে এসেছে। তাঁর বেদখল হয়ে যাওয়া জমি রঞ্জিতা ফিরে পেতে পারেন'— এ খবর ঠিকই ৭১-এর সেই রাজাকারদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গ্রামের মধ্যে এক ধরনের অনিরাপত্তার বোধ তৈরি হচ্ছিল কিংবা অস্বস্তি। আমি রঞ্জিতা মণ্ডলের কাছে জানতে চাইছিলাম, আপনার ভয় করে না, এই যে প্রতিদিন নানাভাবে হুমকি দেয়! আমার এই প্রশ্নে উনার স্বামী তাহের সাহেব (মারা গেছেন) আর স্বয়ং মাসি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, 'নেংটার নাই বাটপারের ভয়!' তাহের সাহেব যুক্ত করেন, 'উনার কোনো ভয়ডর নাই আপা !'

কাজের শেষ দিনে রাজাকারদের গ্রামের দুইজন ব্যক্তি রূপসার ঘাটে ফিরতি পথে সাইকেল করে আমাদের অনুসরণ করতে শুরু করে। পরিচালক ববি আমাদের দুজনের নিরাপত্তা চাইতে ধারণকৃত ভিডিও ক্লিপ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমরা দুই নারীকে রূপসার ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য রঞ্জিতা মল্লিক আমাদের সাথে ভ্যানে চড়ে বসেন। হাতে একটা দা। আমার দিকে তাকিয়ে মাসি তাঁর পান খাওয়া লাল টুকটুকে ঠোঁটে জোরে হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আমারে ডরায়, আমি বীরাঙ্গনা না! হেরা আমার সামনে দাঁড়াইতে পারে না...'।

সমাজের ধর্ষণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, ধর্ষণের বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে প্রত্যেক নারীর লড়াইয়ে সমুদ্রের গর্জন হয়ে উঠুক ভিকটিম/সার্ভাইভার নারীর অভিজ্ঞতা ও তাদের সমুদয় সাক্ষ্য। নারী বীরাঙ্গনাই হয়ে উঠুক, সে ভাবতে শিখুক আদতেই 'নেংটার বাটপারের ভয় থাকে না!'

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। fatama.suvra@gmail.com

তথ্যসূত্র

Brownmillwe, Susan, 1975, *Against Our Will: Men, Women and Rape*, Simon and Schuster, Newyork.

Butalia, U. 1998. *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*. New Delhi: Viking Penguin India; Menon, R. and K. Bhasin, 1998. *Borders and Boundaries: Women in India's Partition.* Kali for Women: New Delhi.

Guharhakurta, M., 1985, *Gender, Violence in Bangladesh: The Role of the State*, In the Journal of Social Studies, SonyK publication, Dhaka.

Koenig, Doriana Margaret, *Women and Rape in Ethnic Conflict*, In Hasting Women's Law Journal, 5, 2, summer 1994.

Kannabiran, Kalpana, 1996, 'Rape and the Construction of Communal Identity', In Jayawardena, K., and De Alwis, M., (Ed), *Embodied Violence, Communalising Women's Sexuality in South Asia*, India, Kali for Women.

Mookherjee, Nayanika, 2002, *A Lot of History: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh Liberation War of 1971*, D. Phil thesis in Social Anthropology, SOAS, University of London, London.

Rhonda Copeland, *Surfacing Gender: Re-engraving Crimes Against Women*, In Hasting Women's Law Journal, 5, 2, summer 1994.

ইব্রাহিম, নীলিমা, ১৯৯৫ (১৯৯৪), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১ম ও ২য় খণ্ড), জাগৃতি, ঢাকা।

গায়েন, কাবেরী, ২০১৩, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা, ১৯৯৫, *নারীবাদী দৃষ্টিতে ধর্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৫৮, ঢাকা, সনিকে প্রকাশনা।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৮, *অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ : বহুমাত্রিক সহিংসতা ও নারী জীবনের পুনর্গঠন*, (অপ্রকাশিত) স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক গবেষণা থিসিস।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা, ১৯৯৮, *সহিংসতা এবং নিপীড়ন : নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া*, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৬৬, ঢাকা, সনিকে প্রকাশনা।

চক্রবর্তী, ভানু, ২০০৪, *পথে বিপথে : মেয়েদের নিরাপত্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এবং আলাপ।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৯, *আমি কী নারীবাদী? নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণার অভিজ্ঞতা*, নারী ও প্রগতি, সংখ্যা ৮, বর্ষ ৪, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (পুনরায় প্রকাশিত জেন্ডার ও যোগাযোগ, প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ, জুন ২০১০, বাঙলায়ন প্রকাশনী)।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, *২০১০, ভীষণ চেনা : সহিংসতাবিদ্ধ নারী গবেষকের নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণা অভিজ্ঞতা*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ১১০, সেপ্টেম্বর ২০০৯, সনিকে প্রকাশনা।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০১৬, *"'সতীরই' কেবল ধর্ষণ হয়" : সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা*, ব্লাস্ট প্রকাশনী, ঢাকা।

সুলতানা, মির্জা তাসলিমা, এবং ইসলাম, সাদাফ নূর-এ, ২০১১, *নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা : নারীবাদী দর্শনের সাম্প্রতিক সংকট ও উত্তরণ ভাবনা*, আহমেদ, রেহনুমা, সম্পাদিত, পাবলিক নৃবিজ্ঞান : প্রবল ও প্রান্তিক ১, দৃক বুকস, ঢাকা।

খাতুন, সায়েমা, ২০১১, *মুক্তিযুদ্ধ : ইজ্জত ও লজ্জা*, আহমেদ, রেহনুমা, সম্পাদিত, পাবলিক নৃবিজ্ঞান : প্রবল ও প্রান্তিক ২, সন্ধি প্রকাশনী, ঢাকা।